নিঝুম নিশিরাতে

ইমদাদুল হক মিলন

পুনশ্চ

॥ ১ ॥

তোর সাহস কেমন রে?

আমি মুখ ঘুরিয়ে মন্টুদার দিকে তাকালাম। কেন বলো তো?

জানা দরকার।

আছে, মন্দ না।

তার মানে খুব বেশিও না।

খুব বেশি সাহস থাকা কি ভালো?

না তা না...

বাবা বলেন কোনো কিছুই খুব বেশি থাকা ভালো না।

তোর বাবা হলেন শিক্ষক মানুষ। শিক্ষকরা এভাবেই বলেন। সবই জ্ঞানের কথা।

এখন বিকাল প্রায় হয়ে আসছে। দুপুরের পর পর আমি মন্টুদার সঙ্গে বেরিয়েছি। মা ঘুমোচ্ছেন। বাবা দুপুরের খাবার খেয়েই বেরিয়ে গেছেন। আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। তার পরও দুপুরের পর স্কুল কমিটি মিটিং ডেকেছে। বাবাকে তো যেতেই হবে! বাবা স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন।

আমরা ছিলাম সখিপুরে। ওখানকার একটা স্কুলের সিনিয়র টিচার ছিলেন বাবা। তাঁর বন্ধু মামুন আংকেল খুবই বড়োলোক। গার্মেন্টসের ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। নিজ এলাকায় একটা স্কুল করেছেন বহু টাকা খরচ করে। পঞ্চাশ ষাট বিঘা জমির ওপর তিনটা সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। একেবারে আধুনিক ধরনের স্কুল। বাবাকে বললেন, হায়াত, সখিপুরের ওই স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে আয়। স্কুলটা দাঁড় করা।

বন্ধুর কথা ফেলতে পারেননি বাবা। তাছাড়া যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে বাবা খুবই পছন্দ করেন। বন্ধু স্কুল করেছেন, সেই স্কুল দাঁড় করানো তাঁরও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

সখিপুরের পাট চুকিয়ে এখানে চলে এলেন বাবা।

এটাও 'পুর'। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মোশারফপুর গ্রাম। গ্রামটা ছবির মতো। মানুষজন কম। গাছপালা ফসলের মাঠ, একটা খাল চলে গেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। বাঁশবন আছে প্রচুর। সারাদিন শন শন করে হাওয়া বয় গাছপালায়। আর কত যে

পাখি! সারাদিন পাখির ডাক। নির্জন দুপুরবেলাটা ঘুঘু পাখির ডাকে ভারি একটা ঘুম ঘুম পরিবেশ তৈরি হয়।

এই ঘুঘু পাখির ডাকেই কি দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করেই মা ঘুমিয়ে পড়েন! সখিপুরে তো এভাবে ঘুমোতে দেখিনি মাকে!

এখানে আমাদের ভারি সুন্দর একটা বাড়ি দিয়েছেন মামুন আংকেল। বিশাল বাড়ি। ছবির মতো একতলা একটা বিল্ডিং। অনেকগুলো রুম সেই বিল্ডিংয়ে। চওড়া সুন্দর বারান্দা দক্ষিণমুখি বিল্ডিংটার। একটা বাঁধানো ঘাটলার পুকুর আছে। পুকুরের জলটা খুব স্বচ্ছ। বড়ো বড়ো মাছও নাকি আছে অনেক।

পুকুরের ওপারে গাছপালার বন। বাঁশঝাড় আছে অনেকগুলো। বাড়িটা দশ পনেরো বিঘার কম হবে না। সবুজ ঘাসের মাঠ আছে পিছন দিকে। নানা রকমের ঝোপঝাড়। ফলের গাছ আছে অনেক।

এতবড়ো বাড়িটায় মানুষ থাকত মাত্র দুজন। কেয়ারটেকার হোসেন মিয়া আর তার বউ। মধ্য বয়সি নিঃসন্তান দম্পতি। বহু বছর ধরে মামুন আংকেলের সঙ্গে আছে। এই বাড়ির দেখভাল তো করেই, এলাকায় মামুন আংকেলের জমিজমা যা আছে সবই দেখে। হোসেন লেখাপড়া জানা লোক। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। বুদ্ধিমান সাহসী সৎ বিশ্বস্ত।

হোসেন মিয়ার থাকার জন্য আলাদা ঘর আছে। টিনের সুন্দর ঘর। একপাশে রান্নাচালা, পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠানের পাশে জোড়া জামগাছ। অর্থাৎ গলাগলি করে থাকা দুটো জামগাছ।

বিল্ডিংটা সাজানো গোছানো। প্রতিটা রুমে সুন্দর ফার্নিচার। ড্রয়িংরুমে সুন্দর সোফা। ডাইনিং টেবিল আটজন মানুষের। কিচেন একেবারে আধুনিক ধরনের। বাথরুম খুব সুন্দর। ওয়াল কেবিনেটগুলোও সুন্দর। এক কথায় গ্রামের ভিতর একেবারে শহুরে কায়দার বিল্ডিং।

আমরা এখানে এলাম আজ সাতদিন হয়েছে। এসেই শুনেছি স্কুল বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করেই বাড়ির এই বিল্ডিংটা মামুন আংকেল করেছেন। বাবাকে বলেননি কিছুই কিন্তু তাঁর প্ল্যান ছিল বাবাকেই স্কুলের দায়িত্ব দেবেন। এই বাড়ি হবে আমাদের।

সেভাবেই সব হয়েছে।

বাড়ি দেখে বাবা মায়ের মতো আমিও মুগ্ধ। তবে আমি সবচাইতে বেশি মুগ্ধ মন্টুদাকে পেয়ে।

মন্টুদা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে তাঁর। আমার মাত্র তেরো। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এখানে চলে এসেছি।

সখিপুরে বাবা যে স্কুলের টিচার ছিলেন ওই স্কুলেই পড়তাম। পড়ালেখায় খুবই ভালো আমি। প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হতাম। বাবা এমনিতে আমাকে খুবই ভালোবাসেন। যখন যা চাই তাই পাই। শুধু একটা ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। লেখাপড়া। আগে লেখাপড়া তারপর অন্য কিছু।

একবার ফার্স্ট হতে পারিনি। সেকেন্ড হয়েছিলাম। ইস সেবার যে কী রাগ বাবা আমার সঙ্গে করলেন! বেদম বকাঝকা, বেদম রাগারাগি। আমার ঘুম খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাবার ওই রাগারাগির ভয়ে আমি আর সেকেন্ড হওয়ার সাহসই পাইনি। সবার আগে পড়ালেখা, বাবার এই কথা মনে রেখে চলছি।

এবার মন্টুদার কথা বলি।

নামের সঙ্গে 'দা' লাগাবার ফলে মনে হতে পারে মন্টুদা বুঝি হিন্দু পরিবারের ছেলে। আসলে তা না। এলাকার বনেদি মুসলমান পরিবারের ছেলে। চৌধুরি। মন্টুদার পুরো নাম মন্টু চৌধুরি। তাঁর বাবা জসিম চৌধুরি ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী লোক। গ্রামের অর্ধেকের বেশি জায়গা জমি তাঁদেরই ছিল। জসিম চৌধুরি বেঁচে থাকতেই জায়গা সম্পত্তি অনেক বিক্রি করেছেন। সেই সব জমিই মামুন আংকেল কিনেছেন। তার পরও, এখনও মন্টুদাদের বাড়িঘর আর ফসলের জমি যা আছে, আরও এক দুপুরুষ শুয়ে বসে খেতে পারবে।

মন্টুদার ভাই বোনরা সবাই উচ্চশিক্ষিত। মা বাবা বেঁচে নেই। ভাই বোনরা কেউ গ্রামে থাকেন না। কেউ ঢাকায়, কেউ আমেরিকা কানাডায়। অস্ট্রেলিয়ায় আছেন একবোন। মন্টুদা সবার ছোটো। লেখাপড়া তেমন করেননি। ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর আর লেখাপড়া করেননি। একটু ভবঘুরে টাইপ, পরোপকারী যুবক। এলাকার সবাই তাঁকে খুবই ভালোবাসে। মানুষের বিপদ আপদে মন্টুদা আছেনই। গ্রামের যে কোনো কাজে যে তাঁকে ডাকে, মন্টুদা হাজির। কারও মেয়ের বিয়ে, না ডাকলেও মন্টুদা গিয়ে হাজির। বিয়ে বাড়ির কাজ যতটা সম্ভব করে দেবেন। কারও অসুখ করেছে, হাসপাতালে নিতে হবে, রাত দুপুরেও যদি সেই খবর পান, আর কেউ থাকুক না থাকুক মন্টুদা আছেন। কোনো গরিব মানুষের বাড়িতে রান্না হয়নি, মন্টুদা চাল ডাল মাছ তরকারি পৌঁছে দেবেন সেই বাড়িতে। চাঁদা তুলে গরিব মানুষের মেয়ের বিয়ে, টাকার অভাবে পড়তে পারছে না এমন ছেলেমেয়েকে পড়ানো, অর্থাৎ বিপদে পড়া মানুষের পাশে মন্টুদা আছেনই।

মন্টুদা থাকেন তাঁর একমাত্র চাচার কাছে। চাচার তিন মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। গ্রামে চাচা চাচি একা। চাচা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য গ্রামে পড়ে আছেন মন্টুদা। একটা জিন্সের প্যান্ট আর টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়ান। পায়ে পুরোনো

কেডস। মাথার চুল লম্বা, মুখে সাধুসন্তের মতো গোঁফ দাড়ি। আর চেহারা এত সুন্দর মন্টুদার! দেবদূতের মতো লাগে দেখতে। মুখে হাসিটা লেগেই আছে। কথা বলেন খুব সুন্দর করে। অত্যন্ত আলাপী মানুষ। যেদিন এই বাড়িতে এলাম সেদিনই বিকালবেলা মন্টুদা এসে হাজির। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাবা মা আমি, আমরা তিনজনই তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম।

তারপর থেকে যখন তখন মন্টুদা আমাদের বাড়িতে আসেন, আমি মন্টুদাদের বাড়িতে যাই। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান নয় দশ বছর। তার পরও এই এলাকায় এখন পর্যন্ত তিনিই আমার একমাত্র বন্ধু।

আজ দুপুরের পর মন্টুদা এসে বললেন, চল অভি, তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।

কোথায়?

আরে চল না। গেলেই দেখতে পাবি।

চলো।

আমি মন্টুদার সঙ্গে বেরোলাম।

বাড়ির সামনের দিককার পথ মন্টুদা ধরলেন না। পিছন দিককার বাঁশঝাড় তেঁতুল আম জাম কাঁঠাল সফেদা এসব গাছপালায় ঘিরে থাকা জায়গাটা দিয়ে আমাকে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

আজকের আগে এদিকটায় সেভাবে আমার আসা হয়নি। এসে একটু অবাকই হলাম।

বাড়ির শেষ থেকেই শুরু হয়েছে ফসলের মাঠ। কিছু দূর গিয়ে একটা বনভূমি। অনেকটা জায়গা জুড়ে নানা রকম গাছপালা, বুনো ঝোপঝাড়। দুপুরের পর পরই কেমন নিঝুম হয়ে আছে জায়গাটা। শুধু হাওয়া বইছে, গাছপালায় পাখি ডাকছে। দুপুর শেষের রোদে হাওয়ার চলাচল, পাখির ডাক এসব থাকার পরও কেমন নির্জন, শব্দহীন লাগছে জায়গাটা।

মন্টুদা।

বল।

তুমি কি আমাকে এই বন দেখাতে আনলে?

না রে।

তবে?

এই বনের ওপারে, বেশ দূরে হচ্ছে আসল দেখার জিনিস।

কী সেটা?

আগে বলে দিলেই তো সব শেষ। চল, দেখ দূর থেকে।

আমরা বনের দিকটায় হাঁটতে লাগলাম।

মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকেছি, দেখি ঝোপঝাড়ে এমন অবস্থা, হাঁটাচলা বেশ কষ্টের। ঝোপঝাড় ভেঙে হাঁটতে হচ্ছে।

মামুন আংকেলের বাড়ির পিছনেই এমন বন কেন?

মন্টুদা বললেন, এগুলোও আমাদেরই জমি ছিল। এই পুরো এলাকাটাই এক সময় বন হয়ে গিয়েছিল। সাহেবরা যখন ছিল তখন এতটা বন জঙ্গল ছিল না। তারা সাফ সুতরো করেছিল।

সাহেব কারা?

পরে বলছি। বললাম না আমাদের জমি ছিল প্রায় সবই। মামুন আংকেলের মতো আরও কেউ কেউ কিনে নিয়েছেন। এই বনটাও এখন মামুন আংকেলেরই। শুনেছি এই এলাকায় তিনি বিশাল একটা কৃষি খামার করবেন। এজন্য শুধু জমি কিনছেন। চারশো বিঘার মতো কেনা হয়েছে। আরও কিনবেন। যে জায়গাটা তোকে এখন দেখাব ওই পর্যন্ত তিনি কিনতে চান। এই বনের পর থেকে সব জমির মালিক এখন আমরা একা না, আরও কেউ কেউ আছে। তবে তারা একসময় আমাদের প্রজা মতো ছিল। আমাদের জমি চাষ করত। পরবর্তীতে জমির মালিক হয়ে গেছে। তাদের কাছ থেকেও কিনতে হবে। তবে আমি বা চাচা যা বলব তাই হবে। আমাদের কথা ওরা শুনবে। মামুন আংকেলকে চাচা কথা দিয়েছেন, ওদিককার আমাদের জমিগুলো তো তাঁকে দেবেনই, অন্যদেরগুলোও কিনে দেবেন। এলাকায় মামুন আংকেল স্কুল করেছেন। গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়বে। হায়াত স্যারের মতো স্যারকে হেডমাস্টার করে এনেছেন। এখন যদি হাজার দেড়হাজার বিঘার ওপর কৃষি খামার করেন তাহলে এলাকার বহুলোকের কর্ম সংস্থান হবে। গরিব মানুষরা কাজ পাবে।

কথা বলতে বলতে আমরা বনের উত্তর পাশটায় চলে এসেছি। এদিকে বনভূমির পরই আবার ফসলের মাঠ। কিলোমিটার খানেক দূরে এই বনভূমির মতোই গাছপালা ঘেরা একটা জায়গা। পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ি বা ভাঙাচোরা বহু পুরোনো দিনের দরদালান টাইপের কিছু যেন; এই এতদূর থেকেও দেখা যায়।

মন্টুদা বললেন, ওই দেখ। ওই যে এরকম বনভূমির মতো বনভূমিটা দেখছিস, তার পশ্চিম দিকটায় তাকা।

দেখছি। কী ওটা?

ওটাই তোকে দেখাতে আনলাম।

এই জিনিস দেখার কী আছে?

জিনিসটা কী, অনুমান কর তো?

পুরোনো জমিদার বাড়ি হবে। পরিত্যক্ত। এখন আর কেউ থাকে না। তবে এতদূর থেকে পরিষ্কার বুঝতেও পারছি না। অনুমান করছি। পুরোনো দিনের জমিদার বাড়ি।

না জমিদার বাড়ি না।

তবে?

নীলকুঠি।

আমি অবাক। নীলকুঠি?

হ্যাঁ। ওই যে সাহেবদের কথা বলছিলাম, ওই সাহেবদের নীলকুঠি। এই এলাকায় নীল চাষ করতে এসেছিল ব্রিটিশ সাহেবরা। তারা চলে যাওয়ার পর থেকে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে গেছে। সাহেবরা কয়েকজন মারা গিয়েছিল ওখানে। তখন খুব ম্যালেরিয়া হত। ম্যালেরিয়ায় মরেছে। কয়েকজনের কবর আছে কুঠির অঙিনায়। ভয়ে কেউ যায় না ওখানে।

ভয়ের কী আছে?

আছে, ভয়ের কারণ আছে।

কী কারণ বলো তো?

শেষ পর্যন্ত যে সাহেব বেঁচে ছিলেন তাঁর নাম মরগান সাহেব। পুরো নাম জেমস মরগান। বুড়ো থুত্থুরা হয়ে মারা গেছেন। আসলে নাকি মারা যাননি। এখনও বেঁচে আছেন। কোনো-কোনো রাতে তাঁকে দেখা যায়। একটা লণ্ঠন হাতে বাড়ির এদিক ওদিক চলাফেরা করেন। বয়স হয়েছে আড়াই শো বছরের মতো।

আমি হেসে ফেললাম। ধুৎ। আড়াই শো বছর কোনো মানুষ বাঁচে নাকি? কী অদ্ভুত কথা!

এই অদ্ভুত ব্যাপারটাই আমি নিজ চোখে দেখতে চাই।

কীভাবে দেখবে?

নীলকুঠিতে যাব।

যাও।

আমার সাহস খুব কম না। তার পরও একা যেতে ভয় লাগে। গ্রামের যাকেই বলেছি, চলো যাই, দেখি বুড়ো সাহেবটাকে সত্যি দেখা যায় কি না। কেউ সাহস পায় না। শুনলেই ভয়ে পালায়। উরে বাপ রে বাপ! নীলকুঠি? মরে গেলেও যাব না। বুড়ো সাহেবটা রাতেরবেলা কবর থেকে সবাইকে ডেকে তুলে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে বসে গল্প গুজব করেন, খাওয়া দাওয়া করেন। কখনো-কখনো দিনেরবেলাও দেখা যায় ওই দৃশ্য। ওরকম দৃশ্য দেখলে ভয়ে তখনই মারা যাব।

লোকে তাই বলে?